‘কোর্স কারিকুলামের দুর্বলতার কারণে আমরা দিন দিন হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে পিছিয়ে পড়ছি’

ড. আহসান চৌধুরী
কনজিউমার চিপ ডিজাইনার
সিরিয়াস লজিক, অস্টিন, যুক্তরাষ্ট্র

কয়েক বছর আগেও কম্পিউটার সায়েন্স ছিল দেশের সেরা ছাত্রদের সবচেয়ে পছন্দের বিষয়। কিন্তু দিনে দিনে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স। এর পেছনের কারণ হিসাবে সবাই দায়ী করেন চাকরির স্বল্পতাকে। কিন্তু কোর্স কারিকুলাম ও পড়াশোনার মানের দুর্বলতার জন্যই যে চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা নিয়ে আমরা ভাবছি না। এছাড়া সফটওয়্যার খাতে আমরা এগিয়ে গেলেও ক্রমেই পিছিয়ে পড়েছি হার্ডওয়্যার খাতে। কিন্তু সফটওয়্যারের চেয়ে হার্ডওয়্যার খাতেই আছে বেশি লোভনীয় চাকরি ও আউট সোর্সিং-এর সুযোগ। হার্ডওয়্যার খাতের এসব সুযোগগুলো, আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে পেতে পারেন, সে নিয়েই কথা বলেছেন বাংলাদেশের কৃতি কম্পিউটার প্রকৌশলী ড. আহসান চৌধুরী।
সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মেহেদী হাসান সুমন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে ক্রমশ পিছিয়ে পরছে। তাদের সাহায্য জন্য কি প্রবাসী বাঙ্গালীদের কোন সংগঠন আছে?

ড. আহসান চৌধুরী : আসলে আমাদের এখনো ঐ রকম কোনো সংগঠন নেই। মূলত আমার মতো যারা প্রথমে বাংলাদেশে পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় পড়াশোনা ও ভালোমানের চাকরি করছেন। এ রকম ৮-১০ জন মিলে আমরা একটা টিম গঠন করার চেষ্টা করছি। টিমের সবাই চিপ ডিজাইনিংয়ের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছেন। আমাদের সবারই একই উদ্দেশ্য আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা যে দিন দিন হার্ডওয়্যার মার্কেটে পিছিয়ে পড়ছে, তারা ভালো মানের চাকরি পাচ্ছে না। এমনকি আউটসোর্সিংও হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমরা দলগতভাবে সাহায্য করতে চাই এবং ভবিষ্যতে এ দলের সদস্য সংখ্যা অনেক বাড়বে। কারণ পুরো আমেরিকায় প্রচুর বাংলাদেশী আছেন যারা আমেরিকার হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন। আমরা তাদের সবাইকে নিয়ে, দলগতভাবে কাজটা করতে চাই।

২০০০ : আপনারা এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ড. আহসান : গত ডিসেম্বরের ২২ ও ২৩ তারিখ বুয়েট ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা (বিসিডিএ) যৌথভাবে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। ‘কাটিং এজ আইসি ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইম্পলিমেন্টেশন: প্রাকটিসেস্ উইথ গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি পাসপেক্ট’ শীর্ষক এই কর্মশালায় আমাদের টিমের আমিসহ চারজন সদস্য অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই কর্মশালায় দেশের প্রায় প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আমাদের টিমের মধ্যে আমি ছিলাম সিরিয়াস লজিক থেকে, এছাড়া ইন্টেল, আইবিএম ও মোটোরোলার তিনজন সদস্য ছিলেন। আমরা এই দুদিনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম পরীক্ষা করে দেখেছি, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সে ইন্ডাস্ট্রি যেসব বিষয় চায় সেগুলো নেই, আর থাকলেও খুব সীমিত পরিসরে আছে।

২০০০ : আপনি তো দেশেও পড়াশোনা করেছেন, বাইরেও পড়াশোনা করেছেন। আপনার দৃষ্টিতে আমাদের এখানকার পড়াশোনার মূল দুর্বলতা কি?

ড. আহসান : আসলে আমাদের এখানকার কোর্স কারিকুলাম আপডেটেড নয়। এখানে এমন সব থিওরি পড়ানো হয়, সেগুলো উন্নত বিশ্বে ১৫ বছর আগে পড়ানো হতো। এছাড়া ইন্ডাস্ট্রি যেসব থিওরি বা প্রাকটিক্যাল নলেজ চায় সেসব বিষয়গুলো আমাদের কোর্স কারিকুলামে একেবারেই থাকে না। তবে বর্তমানে বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম বেশ আপডেটেড বলে আমার মনে হয়েছে।

২০০০ : আমাদের এখানে তো প্রায় সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স আউটলাইন অনুসরণ করে। তার পরেও কেন সেটা মানসম্পন্ন হচ্ছে না কেন?

ড. আহসান : বেশ কিছুদিন ধরে এই ধারাটি আমাদের এখানে চালু হয়েছে। নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে বলা হয় আমরা ম্যানচেস্টার, অক্সফোর্ডের কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করছি। এটা হওয়া মানেই, যে আমরা ম্যানচেস্টারের মানের শিক্ষা পাবো তা কিন্তু নয়। তাছাড়া আমরা এখন পর্যন্ত এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম পাইনি, যা ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা পূরণ করতে পারে। এমনকি এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরাও আমাদের ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারছে না। আমাদের এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রচার করছে, আমরা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম অনুসরণ করি, অথবা আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে ডিগ্রি দিচ্ছি। আমাদের অভিভাবকরা এই প্রচারণা দেখে ভাবেন যে, আমার ছেলে বা মেয়ে যদি এখানে পড়ে,

তাহলে একটা ভালো চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু এটা পুরোপুরি ভুল ধারণা। কারণ আমরা যখন ইন্টারভিউ নেই, তখন অনেক এমআইটি, স্টানফোর্ডের ছাত্রদেরও বাদ দেই। এমআইটি থেকে পাস করলেই যে চাকরি পাওয়া যাবে, সেই দিন আর নেই। তবে এমআইটি দেখলে আমরা একটা শিক্ষার্থীর আবেদনপত্র হয়তো নেই। এই সুবিধাটুকু সে পায়। তারপরে আমরা তখন তাকে যে সকাল ৮ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৯ ঘণ্টার টেকনিক্যাল ইন্টারভিউতে ডাকি। এ ইন্টারভিউতে কিন্তু এটা দেখা হয় না সে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করছে। যে ইন্টারভিউতে ভালো করবে আমরা তাকেই নেবো। ইন্ডাস্ট্রি তো আসলে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এখানে একজন নামকরা লোককে নিয়ে বসিয়ে রাখার সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এটা করতে পারে। নামকরা একজন লোক নিয়ে ডিন বা চেয়ারম্যান বানিয়ে বসিয়ে রাখতে পারে। ইন্ডাস্ট্রি আজকে একজনকে নিয়োগ দিয়ে আগামীকালই তার কাছ থেকে আউটপুট চাইবে।

২০০০ : কিন্তু আমাদের এখানে তো আউটসোর্সিং করার জন্য যে ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা দরকার, তা তো আমাদের এখানে নেই...

ড. আহসান : আসলে সবক্ষেত্রেই প্রথমে দরকার দক্ষ জনশক্তি। ভালো মানের প্রশিক্ষিত লোকবল থাকলে তারা এখানেও আউটসোর্সিং কোম্পানি গঠন করতে পারবে কিংবা বাইরে চাকরি করতে পারবে।

২০০০ : এ অবস্থায় আপনারা আসলে কিভাবে সাহায্য করতে চাইছেন?

ড. আহসান : আমরা আসলে প্রথম অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সাহায্য করতে চাই। এই যে কর্মশালাটি করলাম, এখানে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ছিলেন। আমরা এই কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম ইভালুয়েট করে দিয়েছি। কোর্স কারিকুলামের অপেক্ষাকৃত পুরাতন বিষয়গুলো, যেগুলো এখন আর দরকার নেই। সেগুলো বাদ দিয়ে, প্রয়োজনীয় ও আপডেটেড বিষয়গুলো সংযুক্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি। তবে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি যৌথ সংগঠনের দরকার। যারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও আমার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। যদিও আইইউটির সাবেক উপাচার্য ড. আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা (বিসিডিএ) নামের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারা আমাদের ও দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করতে চান। এটা অবশ্যই একটা ভালো উদ্যোগ। ফলে তারা সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদাগুলো আমাদের জানাতে পারবেন। আমাদের জন্যও সুবিধা হবে। কারণ আমাদের পক্ষে তো সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়।

২০০০ : আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার চেয়ে পাস করানোটাই বেশি গুরুত্ব দেন। সে ক্ষেত্রে তারা কি কোর্স কারিকুলাম সংশোধনে উৎসাহিত হবে?

ড. আহসান : এটা ঠিক আমাদের দেশে শিক্ষা ক্রমশই ব্যবসার সঙ্গে ঝুঁকে পড়ছে। এ বিষয়ে আসলে আমি কথা বলতে চাই না। আসলে আমরা কোর্স কারিকুলাম সংশোধন করতে চাই। এটা করলে কোর্সটি যে কঠিন হয়ে যাবে এ ধারণা সঠিক নয়। আসলে একজন শিক্ষার্থী চার বছর ধরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়, তখন সে প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিখছে। আমরা চাই যে, তাদের কোর্স কারিকুলামে যে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে নতুন ও দরকারি বিষয় সংযুক্ত করতে চাই। আমাদের দেশের একটা সাধারণ সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিখছে না। অনেকে দেখা যায় যে, পড়াশোনা শেষ করার পর নিজে নিজে পড়ছে। কিংবা অন্যের সাহায্য নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে দরকারি বিষয়গুলো শিখছে। তাহলে চার বছরের পড়াশুনা সে কী শিখল? কোর্সগুলো আপডেটেড করলে এই বাড়তি সময় নষ্ট হবে না।

২০০০ : আমাদের এই দুর্বলতার জন্য ভাষাগত সমস্যা কতটুকু দায়ী?

ড. আহসান : ভাষা এখানে সমস্যা নয়। ভালোমানের কাজের জন্য স্মার্ট কথা বলা দরকার। আসলে হাইটেক ইন্ড্রাস্টিতে কাজ করার জন্য ইংরেজি জানা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। চাইনিজ, জাপানিজ কিংবা কোরিয়ানরা আমাদের চেয়ে অনেক কম ইংরেজি জানে। তার পরও তারা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো কাজ করছে। এর কারণ হলো, এ ধরনের টেকনিক্যাল কাজ করার জন্য যে টেকনিক্যাল স্কিল দরকার সেটা তাদের যথেষ্ট আছে। এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি জানা ভালো, তবে এ ক্ষেত্রে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজ জানাটাই আসল ব্যাপার। একজন চাইনিজ ছাত্র অতটা ইংরেজি না জানলেও সে একটা উচ্চবেতনের চাকরি খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা যখন তার বায়োডাটা দেখি, তখন দেখি যে সে অনেক কিছুই জানে, অনেক টুল রান করাতে পারে। অনেক ভালো মানের প্রজেক্ট করেছে। তখন আমরা তাকে সহজেই চাকরিটা দিয়ে দিই। আবার চীনে যদি ১০ জন চাইনিজ মিলে একটা আউটসোর্সিং ফার্ম খোলে তখন তারা শিখতে পারে যে আমাদের এতজন হাইস্কিলড্ লোক আছে। তারা এগুলো জানে, এ ধরনের কাজ করতে পারে। যখন আমরা তাদের এত ভালো একটা প্রফোইল দেখি, তখন দেখি যে, আমাদের যা যা প্রয়োজন সবই তারা পারে। তখন তাদেরকেই আমাদের আউটসোর্সিং কাজটি দিয়ে দিই।

২০০০ : এ ক্ষেত্রে বাইরে যারা বাংলাদেশী অভিজ্ঞ কর্মকর্তা আছেন, তারা কী ধরনের সাহায্য করতে পারেন?

ড. আহসান : আমরা দুই দিনের যে কর্মশালাটা করেছি সেখানে তুলে ধরেছি ঠিক কী কী বিষয় আমাদের শেখা দরকার। যেমন ধরুন ডিজিটাল ডিজাইন, অ্যানালগ ডিজাইন, চিপ ইন্টিগ্রেশন প্রভৃতি বিষয় কোর্সে শেখাতে হবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটা মডেল কোর্স কারিকুলাম করে দেখিয়েছি। এখন যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাহলে আমরা আরও বিস্তারিতভাবে করে দেব। তাদের কোর্স কারিকুলাম ইভালুয়েট করে দেব। দকার হলে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে দেব। আসলে এটা হবে একটা দীর্ঘমেয়াদি

ড. আহসান চৌধুরী

ড. আহসান চৌধুরী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল বিভাগ থেকে ১৯৮৮ সালে গ্রাজুয়েশন ও ১৯৯০-এ মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি বুয়েটের তড়িৎ কৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯০ সালে তিনি কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে জন্য বুয়েটের 'ড. রশীদ স্বর্ণপ্রদক' অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকা চলে যান। অস্টিনের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস থেকে তিনি ১৯৯২ সালে মাস্টার্স এবং ১৯৯৬ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৩ সাল থেকেই তিনি আমেরিকার হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা শুরু করেন। তিনি মূলত চিপ ডিজাইন, সিস্টেম ডিজাইন, মেথোলোজি ডেভেলপমেন্ট, ইম্পলিমেন্টেশন নিয়ে কাজ করেন। প্রায় ১২ বছর ধরে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিখ্যাত চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে চিপ ডিজাইনিংয়ের কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি অস্টিনের সিরিয়াস লজিকে কর্মরত আছেন। এখানে তিনি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স-এর চিপ্ নিয়ে কাজ করছেন। এপর্যন্ত প্রায় দশটি চিপ্ ডিজাইন করেছেন। যার সবগুলোই বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে আগ্রহী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যে কোন ধরনের সাহায্যের জন্য ড.আহসান চৌধুরীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করতে পারেন।

ইমেইল: **zareefc@yahoo.com**

প্রোগ্রাম। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

২০০০ : বাইরে কাজ করার জন্য দেশের একটা পরিচিতি দরকার। আমরা মনে হয় এই দিক দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি...

ড. আহসান : আসলে এটা পুরোপুরি ঠিক নয়। বিদেশীরা জানে আমরা সফটওয়্যারের ফিল্ডে ভালো কাজ করতে পারি। বাইরে থেকে যেকোনো কাজ এলে আমরা করে দিতে পারব। এ জন্যই এ ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং হচ্ছে। এমনকি বড় কাজগুলোও এখানে হচ্ছে। দরকার হলে ভারত থেকে এক্সপার্ট এনেও কাজ হচ্ছে। কিন্তু হার্ডওয়ারের ক্ষেত্রে এ দৃশ্যটি পুরোপুরিই আলাদা। বাইরের লোকজন জানে সফটওয়্যারের কাজ আমরা করতে পারি, কিন্তু হার্ডওয়ারের কাজ পারি না। এটা একেবারে ডেড লক হয়ে গেছে। আরেকটা বিষয়, গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিতে ভারতীয় কিংবা চাইনিজরা অনেক দিন ধরেই কাজ করছে। তারা অনেক উচ্চপদে আছে। সে তুলনায় বাংলাদেশীরা অনেকটা পিছিয়ে আছে। এর কারণে হয়তো আমাদের দেশের পরিচিতিটা অতটা জোরালো নয়।

২০০০ : অনেক সময় দেখা যায়, খুব বড় পদে বাংলাদেশীরা থাকলেও আমরা কাজের ক্ষেত্রে আলাদা সুবিধা পাচ্ছি না কেন?

ড. আহসান : না, এটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমরাও সাধ্যের মধ্যে যতটা করা সম্ভব তা করছি। তবে সমস্যা হলো, বাংলাদেশীরা তেমন বড় কোনো পদে এখনো যেতে পারেনি, যেটা ভারতীয় ও চাইনিজরা পেরেছে। সে জন্যই তারা যতটুকু সাহায্য করতে পারছে, আমরা ততোটা হয়তো পারছি না। আসলে আউটসোর্সিং কাজ অনেকটাই ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। আসলে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে বাংলাদেশীদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। আর হাজার হাজার ভারতীয় এই লেভেলে আছে। সে জন্য আমরা হয়তো কিছুটা পক্ষপাতের শিকার হই। আমরা আশাবাদী, আগামী বছরগুলোতে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে আমাদের অবস্থান বাড়বে। আমরাও এসব সুযোগ-সুবিধা পাব। আসলে হার্ডওয়ার ফিল্ডে কাজ করার মতো অভিজ্ঞ লোক আমাদের দেশে এখনও তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি।

এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। কয়েক দিন আগে আমি একটা কাজ ভারতকে দিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি জানি, এরকম কাজ করার মতো একটা লোকও আমাদের দেশে নেই।

তবে সফটওয়্যারের কাজ হলে, জোর করে হলেও বাংলাদেশেই দিতে পারতাম। আসলে হার্ডওয়্যার খাতে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ছি। আর এটা মনে রাখতে হবে, হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে আরও বেশি টাকা পাওয়া যাবে। সে জন্য এ খাতটিতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

২০০০ : আমাদের তো প্রচুর গ্র্যাজুয়েট পাস করছে। তার পরেও কেন সমস্যা?

ড. আহসান : হ্যাঁ আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে। কিন্তু স্কিলড গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে না। আসলে এ ধরনের কাজের জন্য স্কিলড্ লোকবল বেশি দরকার। আমাদের শিক্ষার্থীরা ৪ বছরে অনেক কিছুই শিখছে। কিন্তু তাদের যেগুলো বেশি শেখা দরকার, সেগুলো তারা শিখছে না। অনেক সময় দেখা যায়, তাদের শিক্ষকরাই বিষয়গুলো ভালোভবে জানে না। তারা আর কী শিখবে! কিছুদিন আগে আমি একজন বাংলাদেশী শিক্ষর্থীর ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। তার থিউরিটিক্যাল জ্ঞান খুবই ভালো। তাকে যেসব প্রশ্ন করলাম, সবগুলোই সে আমাকে ভালোভাবে প্রমাণ করে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন তাকে আমি একটি রিয়েল ওয়ার্ল্ড সমস্যা দিলাম, তখনই সে আটকে গেল। আসলে আমাদের শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে অনেক বেশি ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এ কারণে আমাদের প্রথমেই দরকার কোর্স কারিকুলামে ব্যবহারিক বিষয়গুলো সংযুক্ত করা।

২০০০ : আমরা তো সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে খুব ভালো করছি। তাহলে কেন হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে পিছিয়ে পড়ছি?

ড. আহসান : সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করা অনেক সহজ। এখানে অবকাঠামো, দক্ষতা রিসোর্স, ম্যাটেরিয়াল- এগুলোর কোনোটাই অতটা বেশি দরকার নেই। স্থাপন ও সহজ কয়েকটি সাধারণ মানের পিসি আর 'সি' কম্পাইলার, আর কিছু সফটওয়ার টুল নিয়ে সাফটওয়্যার ফার্ম স্থাপন করা যায়। এখানে বিনোয়োগও অতটা বেশি লাগে না। এছাড়া বিদেশেও আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির একটা গুডউইল আসছে। সে কারণে আউটসোর্সিংও হচ্ছে। এছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সফটওয়্যার ওয়েরিয়েন্টেড কিছু প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে। ফলে আমাদের এ ইন্ডাস্ট্রিটা খুব দ্রুত ডেভেলপ করেছে। আর হার্ডওয়ার আউটগোয়িং কোম্পানি স্থাপন করা অনেক ব্যয়বহুল। কিছু কিছু টুল আছে, যেগুলোর দাম প্রায় ৫০ হাজার ডলার। তবে অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশী ডোনারদের কাছ থেকে খুব কম দামেই এগুলো পেয়ে যেতে পারে। এছাড়া ল্যাব স্থাপন কিংবা ফ্রেবিকেশনও অনেক ব্যয়বহুল।

২০০০ : তাহলে তো এত বড় বিনিয়োগ আমাদের দেশে সম্ভব নয়...

ড. আহসান : এটা মোটেও ঠিক নয়। যদি আমাদের স্কিলড্ লোক থাকে তাহলে অনেক কাজই আমরা করতে পারব। হার্ডওয়্যার ফিল্ডে অনেকগুলো সেক্টর আছে। যেমন চিপ ডিজাইনের মতো কাজগুলো আমরা করতে পারি। এগুলো ব্যয়বহুল নয়। আমরা ডিজাইনের কাজগুলো করে বাইরে পাঠিয়ে দিত পারি। সেখানে ফেব্রিকেশনের মতো ব্যয়বহুল কাজগুলো ওরাই করে নিতে পারবে। ডিজাইনের মতো কাজ করতে অত ব্যয়বহুল সেটআপ দরকার নেই, শুধু স্কিলড্ লোক থাকলেই হলো। এছাড়া ডিজাইনকৃত চিপগুলো বা ভেরিফিকেশনের মতো কাজগুলো আমরা করতে পারি। এসব চিপ ডিজাইন কিংবা ভেরিফিকেশনের মতো কাজ করার জন্য যে শিক্ষাটা দরকার সেটা আমাদের নেই।

২০০০ : আপনারা এই উদ্যোগে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

ড. আহসান : বিষয়টি নিয়ে আমি বলতে চাচ্ছিলাম। আমরা বাইরে থেকে ৪-৫ দিনের ছুটি নিয়ে আসি। তখন আমাদের ব্যক্তিগত অনেক কাজ থাকে। তার পরও আমরা চাই এই সীমিত সময়ের মধ্যে দেশের জন্য কিছু করতে। আমরা আমাদের ব্যক্তিস্বার্থকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করি তাদের সাহায্য করার জন্য।

অনেক সময় তারাই বলে, আপনারা যে আমাদের সাহায্য করতে চান, আপনাদের লাভ কী? তারা মনে করেন, আমরা এসেছি ফায়দা লোটার জন্য। আসলে আমরা টাকা-পয়সা চাই না। আমরা চাই দেশীয় ছেলেমেয়েদের যাতে কিছু সাহায্য হয়। তাদের যাতে একটা ভালো চাকরি হয়, সেই সুন্দর ভবিষ্যৎটাই আমরা দেখতে চাই কর্মশালার পরে। অবশ্য ২-৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারা আমাদের সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের কর্মপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করতে চায়। এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। আমরা আসলে এ ধরনের ফিডব্যাকই চাই। তারা যদি আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন তাহলে আমরা তাদের সব সমস্যার মাধান করে দিতে পারব। তাদের জন্য ফান্ডের ব্যবস্থা করতে পারব। কিংবা উপকরণ বই-পুস্তক, প্রোজেক্ট নিয়ে আসতে পারি।

২০০০ : ভালোমানের চাকরির জন্য আমাদের শিক্ষার্থীরা কি কোনো বৈষম্যের শিকার হয়?

ড. আহসান : না; ইন্টেল, আইবিএমের যখন ৫ জন লোক দরকার হয় তখন তারা ইন্টারভিউর আয়োজন করে। ইন্টারভিউর সেরা ৫ জনকেই তারা নিয়োগ করে। এখানে তারা বাংলাদেশী, আফ্রিকান, না আমেরিকান সেটা বিবেচনা করে না। আর অনলাইনেই চাকরীর জন্য আবেদন করা সম্ভব। একজন বাংলাদেশী আবেদনকারীর অভিজ্ঞতা যদি বেশি ভালো হয়, তাহলে তাকেই ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। আরেকটি বিষয়, এসব হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি আমেরিকান ইমিগ্রেশনকে চালু রেখেছে। ইন্ডিয়া থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার লোক এইচ ওয়ান ভিসা নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছে। এইচ ওয়ান ভিসা হলো জব ভিসা। আপনি অনলাইনে আবেদন করলে ওরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আপনাকে পছন্দ হলে তারা আপনার ভিসা ম্যানেজ করবে।

ছবি : **তুহিন হোসেন**